The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXVII, 2021 (pp.107 - 118)
Published in February, 2025

ভাসের ত্রয়ীনাট্যকৃতিতে বিধৃত সমাজব্যবস্থা

ড. লিটন মিত্র *

প্রতিপাদ্যসার: বর্তমান সময়ে আমরা যে সমাজে বসবাস করছি তা একদিনে সৃষ্টি হয়নি। কালের স্রোতে প্রবাহিত হয়ে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে। এই সময়ে এসে হাজার হাজার বছর পূর্বের সমাজ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা সত্যিকার অর্থেই দুরূহ কাজ। তবে সাহিত্য একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যার মাধ্যমে এই দুঃসাধ্য কাজটি সম্ভব হতে পারে। সংস্কৃত নাট্যাঙ্গনে ভাস এক অনন্য নাট্যকার যিনি তেরোটি রূপকের স্রষ্টা। অন্য কোনো লেখকের এত রচনা নেই। কেবল সংখ্যার দিক দিয়ে নয়; তিনি বিভিন্ন শ্রেণির রূপক রচনা করায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। তাঁর রচনাসমূহে উঠে এসেছে সেসময়ের লোকায়ত জীবন, সমাজ, রাজনীতি, ধর্মীয় আচারসমূহ, অর্থনীতি সহ প্রভৃতি বিষয়। তাঁর অধিকাংশ রচনার উৎস রামায়ণ বা মহাভারত হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোনো অলৌকিকত্বের আশ্রয় না নিয়ে নিজস্ব ভঙ্গিমায় সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় নবরূপে প্রকাশ করেছন নাট্যসমূহ। আলোচ্য প্রবন্ধটি ভাসকৃত *স্বপ্নবাসবদত্ত*, *প্রতিমা* ও *চারুদত্ত*–এই নাট্যত্রয়ীর আলোকে সেসময়কার সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করার ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

সংস্কৃত নাট্যাঙ্গনে ভাস একজন প্রথিতযশা নাট্যকার হিসেবে খ্যাত। সংস্কৃত সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র কালিদাস যিনি সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বাঙ্গনে বিস্তৃতি লাভ করেছেন, তিনি স্বয়ং তাঁর *মালবিকাগ্নিমিত্রম্* নাটকের প্রস্তাবনা অংশে ভাসকে প্রথিতযশা হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন “প্রথিতযশসাং ভাস-সৌমিল্ল-কবিপুত্রাদীনাং প্রবন্ধান্ অতিক্রম্য কথং বর্তমানস্য কবেঃ কালিদাসস্য কৃতৌ বহুমানঃ?” (প্রসূন বসু ২৫৯)। এদিক থেকে ভাসকে কালিদাসের পূর্ববর্তী বলা যায়। কেননা কালিদাস ভাসের নাম উল্লেখ করলেও ভাসের কোনো রচনাতেই কালিদাসের নাম উল্লেখ পাওয়া যায় না। প্রথিতযশা এই নাট্যকার ভাস কেবল নামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলেন বহুকাল। যেমন– রাজশেখর (৯ম শতক) তাঁর *সুক্তিমুক্তাবলী*, দণ্ডী (৭ম শতক) তাঁর *কাব্যাদর্শ*, তৃতীয় খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে বা চতুর্থ শতকের শুরুর দিকের নাট্যকার কালিদাস তাঁর *মালবিকাগ্নিমিত্র*, বাণভট্ট (খ্রি. ৬ষ্ঠ শতক) তাঁর *হর্ষচরিত*, বাক্‌পতিরাজ (৮ম শতক), জয়দেব (১২শ শতক) তাঁর *প্রসন্নরাঘব* নামক গ্রন্থে ভাসের নাম উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও বামন (৭ম শতক), অভিনবগুপ্ত (১০ম শতক), ভোজদেব (১১শ শতক) সহ আরো অনেকে তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। এদিক থেকে বিবেচনা করে ভাসকে দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দের নাট্যকার বলা যেতে পারে। অথচ তাঁর রচনার সাথে পরিচয় ঘটে ১৯০৯ সালে।[১] নাট্যকার ভাস মোট তেরোটি রূপক লিখেছেন। রূপকগুলো হচ্ছে– *প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ*, *স্বপ্নবাসবদত্ত*, *প্রতিমা*, *অভিষেক*, *চারুদত্ত*, *অবিমারক*, *পঞ্চরাত্র*, *দূতঘটোৎকচ*, *মধ্যমব্যায়োগ*, *কর্ণভার*, *ঊরুভঙ্গ*, *বালচরিত* ও *দূতবাক্য*। রূপকগুলোর উৎস এবং কাহিনির মধ্যে বৈচিত্র্য নাট্যানুরাগীদের মনকে সহজেই যেমন আন্দোলিত করে, আবার একই সাথে তৎকালীন সমাজব্যবস্থারও একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। একারণে ভাস এবং তাঁর রচনাসমূহ ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

* সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোচ্য প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য হচ্ছে ভাসকৃত *স্বপ্নবাসবদত্ত*, *প্রতিমা* এবং *চারুদত্ত*– এই তিনটি নাটকের সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা। এই রচনাসমূহের কাহিনির উৎস যথাক্রমে গুণাঢ্যের *বৃহৎকথা*, বাল্মীকির *রামায়ণ* এবং কল্পিত বিষয়বস্তু। অথচ ভাসের সমুজ্জ্বল প্রতিভায় রূপকসমূহ একদিকে যেমন মৌলিকত্বের স্থান পেয়েছে, তদুপরি পাঠক মনকেও প্রাণিত করেছে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন এ তিনটি রচনার মধ্যে *স্বপ্নবাসবদত্ত*, *প্রতিমা* অলঙ্কারশাস্ত্রানুযায়ী উৎকৃষ্ট নাটক হলেও *চারুদত্ত* প্রকরণ শ্রেণির রূপক। অঙ্কসংখ্যা বিচারে *চারুদত্ত*-কে নাটক বললেও বিষয়বস্তু নির্বাচন, নায়ক-নায়িকার বৈশিষ্ট্য বিচার করলে প্রকরণ বলাই শ্রেয়। তবে প্রকরণের নিয়ম অনুযায়ী অঙ্ক সংখ্যা এখানে কম। যদিও ভাস তাঁর কেনো রচনাতেই *নাট্যশাস্ত্র* যথাযথভাবে মেনে চলেন নি। *চারুদত্ত* নাটকটির ৫৫ টি শ্লেকের মধ্যে ১৩ টি ব্যতীত অন্য সব শ্লোকের সাথে শূদ্রক রচিত *মৃচ্ছকটিক* প্রকরণের সাথে সাদৃশ্য থাকায় C R Devadhar তাঁর *চারুদত্ত* নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, ``the Cārudatta is a mere abridgment of the Mṛcchakaṭika." (C R Devadhar)। যদিও Belvalkar এ মত সমর্থন করেন নি। বিধৃত সমাজব্যবস্থা আলোচনার পূর্বে রূপকগুলোর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা আবশ্যক। সুতরাং এ আবশ্যকতার প্রেক্ষিতে নাটকগুলোর বিষয়বস্তু সংক্ষেপে আলোচনা করা হলোঃ

স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকের বিষয়বস্তুঃ

নাট্যকার ভাসকৃত এ নাটকটি ছয় অঙ্কবিশিষ্ট। নাটকের শুরুতে অর্থাৎ মগধ রাজকন্যা তপোবনে এসেছেন। সেখানে বৎসরাজ উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ পরিব্রাজক এবং বাসবদত্তা আবন্তিকা বেশ ধারণ করে উপস্থিত ছিলেন। নেপথ্যে কোলাহল শুনে যৌগন্ধরায়ণ কারণ জানতে চাইলে কঞ্চুকী তাঁকে বলেন, মহারাজ দর্শকের ভগিনী পদ্মাবতী মায়ের সাথে দেখা করতে এসেছেন এবং রাত্রিবেলা তপোবনেই অবস্থান করবেন। 'পদ্মাবতী' নাম শোনা মাত্রই যৌগন্ধরায়ণের পুষ্পকভদ্র নামে প্রভৃতি দৈবজ্ঞদের কথা মনে পড়ে। কেননা পূর্বেই তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন মগধ রাজকন্যা বৎসরাজের দ্বিতীয় মহিষী হবেন। আর তাই পদ্মাবতীর প্রতি মন্ত্রীর মনে পরমাত্মীয়তা জন্মে। অন্যদিকে বাসবদত্তাও ভগিনী-স্নেহ অনুভব করেন। এরপর পদ্মাবতী সেখানে উপস্থিত হয়ে সকলের প্রয়োজন অনুযায়ী ইচ্ছা পূরণ করতে চাইলে পরিব্রাজক (মন্ত্রী) বাসবদত্তাকে নিজের ভগিনী পরিচয়ে তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখার প্রার্থনা জানান। অভিজ্ঞ কঞ্চুকী 'ন্যাস' রক্ষা করা দুঃসাধ্য বললেও রাজকন্যা পূর্বে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বিধায় আবন্তিকাকে (বাসবদত্তাকে) নিজের কাছে রাখতে রাজি হলেন। ঠিক এমন সময় সেখানে উপস্থিত হলেন এক ব্রহ্মচারী যিনি কিনা লাবাণক গ্রাম থেকে এসেছেন। মন্ত্রী তাঁর আসার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, আরুণি কর্তৃক বৎসরাজ উদয়ন রাজ্য হারিয়ে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী বাসবদত্তা এবং প্রিয়জনদের নিয়ে লাবাণক গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিলেন। একদিন রাজা গ্রামের বাইরে মৃগয়ায় গেলে সেই গ্রামের এক অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে বাসবদত্তা মারা যান। দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে সেই আগুনে মন্ত্রীও পতিত হন এবং মারা যান। এরপর রাজা মৃগয়া থেকে ফিরে এই মৃত্যুসংবাদ শুনে ভীষণ ভেঙ্গে পড়েন; এমনকী হা প্রিয়ে! হা বাসবদত্তে! বলে হাহাকার করতে করতে আগুনে ঝাপ দিতে চান। তখন সেনাপতি রুমণ্বান তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখেন এবং দিবারাত্রি আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে রাজার সেবা করতে থাকেন। এরপর একসময় রাজাকে নিয়ে রুমণ্বান গ্রাম ছেড়ে চলে যান আর তখন গ্রামও শ্রীহীন হয়ে যায়। একারণে তিনি (ব্রক্ষ্মচারী) বেদ অধ্যয়ন শেষ না করেই গ্রাম ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে তপোবনে এসে হাজির হয়েছেন। ব্রক্ষ্মচারীর মুখ থেকে উদয়নের স্ত্রীর প্রতি এমন ভালোবাসা জেনে একদিকে বাসবদত্তাও যেমন রাজার জন্য আবেগে আপ্লুত হন, অন্যদিকে পদ্মাবতীও তাঁর (রাজার) প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে পড়েন। এরপর প্রথমে ব্রক্ষ্মচারী এবং পরে যৌগন্ধরায়ণও অনুমতি সাপেক্ষে চলে যান। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায়, বাসবদত্তা আর পদ্মাবতী কন্দুকক্রীড়া করছে এমন সময় বাসবদত্তা পদ্মাবতীকে ভাবী মহাসেন-পুত্রবধু বলে সম্বোধন করলে চেটী জানায় পদ্মাবতী বৎসরাজ উদয়নের গুণে মুগ্ধ তাই তাঁকেই রাজকন্যার পছন্দ। হঠাৎ সেখানে ধাত্রী এসে জানায় রাজা

উদয়ন কোনো এক কাজে রাজা দর্শকের কাছে আসলে তাঁর বংশ, কাল, রূপ, বয়স দেখে পছন্দ করেন। তাই পদ্মাবতী সেই রাজার (উদয়নের) বাগদত্তা হয়েছেন। তৃতীয় অঙ্কে রাজকন্যার বিবাহোৎসবে অন্তঃপুরের সবাই যখন উচ্ছ্বসিত তখন বাসবদত্তা দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে প্রমোদ বনে ক্রন্দনরত আছেন। ঠিক সেসময় চেটী এসে জানায় মহারানি বিবাহের জন্য 'অবিধবাকরণ' এবং 'সপত্নীসংহার' নামে দুটি মালা গেঁথে দিতে বলেছেন। কিন্তু বাসবদত্তা অবিধবাকরণ নামে মালাটি গেঁথে দিতে রাজি হলে পরেরটি গাঁথতে রাজি হলেন না। চেটীকে বললেন রাজার স্ত্রী তো আগেই মারা গেছেন। তাই সপত্নী সংহারের মালার আর প্রয়োজন নেই। চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়, বিবাহের পরদিন পদ্মাবতী তাঁর পরিজনসহ বাসবদত্তাকে নিয়ে প্রমোদ বনে গেছেন। তখন পদ্মাবতীর কাছে স্বামী প্রিয় হয়েছেন কিনা বাসবদত্তা জানতে চান। উত্তরে তিনি জানান স্বামীর বিরহে তাঁরও কষ্ট হয়। তিনি মনে করেন বাসবদত্তার গুণাবলি মনে করে রাজা এখনও কষ্ট পান। একথা শুনে বাসবদত্তা নিজেকে ধন্যা মনে করেন। হঠাৎ সেখানে বিদূষক ও রাজার প্রবেশ ঘটে। হাঁটতে হাঁটতে যখন দুজনে মাধবীমণ্ডপে যাচ্ছিলেন, তখন পদ্মাবতীসহ সকলে ধরা পড়ে যাওয়ার ভয়ে চেটি ভ্রমর বসা লতাটিকে একটু কাঁপিয়ে দিলেন। এতে ভ্রমরের আক্রমণ দেখে রাজা উদয়ন আর সামনে না গিয়ে সেখানে প্রস্তরখণ্ডে উপবিষ্ট হয়ে দুজনে গল্প আরম্ভ করেন। বিদূষক জানতে চান, কে তাঁর কাছে বেশি প্রিয়– বাসবদত্তা না পদ্মাবতী? উদয়ন প্রথমে উত্তর দিতে না চাইলেও বিদূষকের অনেক অনুনয়ের পর বলেন, পদ্মাবতী যদিও রূপ, শীল ও মাধুর্যে আমার অত্যন্ত আদরণীয়, কিন্তু বাসবদত্তায় আবদ্ধ তাঁর মনটি হরণ করতে পারে নি। "পদ্মাবতী বহুমতা মম যদ্যপি রূপশীলমাধর্যৈঃ। বাসবদত্তাবদ্ধং ন তু তাবন্মে মনো হরতি।" (শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৪: ৪/৪)। একথা আড়াল থেকে শুনে বাসবদত্তা অনুভব করলেন– এ যেন তাঁর আত্মত্যাগেরই স্বীকৃতি। পঞ্চম অঙ্কে পদ্মিনিকা ও মধুকরিকার কথোপকথনে জানা যায়, একদিন পদ্মাবতী শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন আর তাই বাসবদত্তাকে খুঁজতে বের হন মধুকরিকা। পদ্মাবতীর শয্যা সমুদ্রগৃহে করা হয়েছে। অন্যদিকে বিদূষকও রাজাকে এখবর দিয়ে সমুদ্রগৃহে নিয়ে আসেন। তবে তখনও পদ্মাবতী আসেন নি। এরপর সেখানে বিদূষক গল্প শুরু করলে উদয়ন সমুদ্রগৃহের শয্যায় শুয়ে শুনতে শুনতে একপর্যায়ে ঘুমিয়ে পড়েন। তখন বিদূষক চলে যান। এর কিছুক্ষণ পর সেখানে বাসবদত্তা আসেন। দীপের আলো অল্প থাকায় ভিতরে ঢুকে তিনি পদ্মাবতী শুয়ে আছেন ভেবে তাঁর পাশে গিয়ে শুয়ে পড়েন। হঠাৎ উদয়ন ঘুমের মধ্যে হা বাসবদত্তে বলে ডেকে ওঠেন। প্রথমে বাসবদত্তা শিউরে উঠলেও পরে কিছুটা সময় তাঁর প্রিয়তম স্বামীর পাশে থাকার লোভ পেয়ে বসে। কিন্তু ধরা পরার ভয়ে তিনি দৌড়ে চলে যান, আর উদয়ন বাসবদত্তাকে দৌড়ে গিয়ে ধরতে গিয়ে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে যায়। বিদূষক ঘরে ঢুকতেই উদয়ন বলেন, তিনি বাসবদত্তা জীবিত আছেন। বিদূষক এটা যে স্বপ্ন ছিল বোঝাতে চাইলে রাজা বলেন– এটা সত্যি না স্বপ্ন বুঝতে পারলেও পূর্বে বাসবদত্তা পাশে থাকলে যেমন লাগত ঠিক যেন তেমনই লাগছে বলে জানান। এমন সময় আরুণির বিরুদ্ধে অভিযানের সময় এসেছে বলে জানান হয়। ষষ্ঠ অঙ্কে মিশ্র বিষ্কম্ভকে কঞ্চুকী আর প্রতিহারী (বিজয়া)-র কথোপকথনে জানা যায়, বৎসরাজ্য ফিরে পেয়েছেন রাজা উদয়ন। এ উপলক্ষে মহাসেন ও অঙ্গারবতী কঞ্চুকী ও ধাত্রী বসুন্ধরাকে প্রেরণ করেন রাজা উদয়ন ও বাসবদত্তার একটি চিত্রফলক দিয়ে। ধাত্রী উদয়নের হাতে ছবিটি দিয়ে বলেন, তিনি বাসবদত্তাকে উজ্জয়নী নগর থেকে হরণ করে নিয়ে আসলে মহারাজ আর রাণী মা এই ছবিটি দিয়েই সামাজিকভাবে বিবাহের কার্য সম্পন্ন করেছিলেন। আর আজ বাসবদত্তার প্রতি দুঃখ লাঘবের জন্য এটি পাঠিয়েছেন। রাজার পাশে উপবিষ্ট পদ্মাবতী ছবিটি দেখে চিনতে পেরে রাজাকে সব কথা বলেন। এমন সময় একদিকে পরিব্রাজক বেশে যৌগন্ধরায়ণ এবং অন্তঃপুর থেকে আবন্তিকা বেশে বাসবদত্তা উপস্থিত হলেন। রাজা দেখে দুজনকেই চিনতে পারলেন। মন্ত্রী এমন কাজ না করলে আরুণিকে পরাস্ত করা সম্ভব হতো না বলে জানান এবং সব পরিকল্পনার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। সকলের সুখকর মিলনের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

প্রতিমা নাটকের বিষয়বস্তু:

সাত অঙ্কবিশিষ্ট এ নাটকের শুরুতে প্রতিহারী কাঞ্চুকীয়কে জানায় মহারাজ দশরথের আদেশে দাশরথি রামের রাজ্যাভিষেক হবে। তাই মঙ্গলানুষ্ঠানের আয়োজন শুরু হয়। অন্যদিকে অন্তঃপুরে সীতা পরিচারিকার কাছ থেকে বল্কল নিয়ে কৌতূহলবশত পরিধান করে দেখছেন তাঁকে কেমন মানায় দেখার জন্য। ঠিক সেসময় একজন চেটী এসে জানায় অভিষেক অনুষ্ঠানের পটহ একবার ধ্বনিত হয়ে থেমে গেছে। এরই মধ্যে সেখানে রাম স্বয়ং উপস্থিত হন এবং সীতাকে জানান তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানকালে মন্থরা এসে পিতার কানে কিছু কথা বলেন। এরপর দশরথ দুঃসহ কষ্ট নিয়ে কৈকেয়ীর ইচ্ছানুসারে রামের অভিষেক বন্ধ করে চৌদ্দো বছরের জন্য বনবাস আর ভরতের রাজ্যপ্রাপ্তির আদেশ দেন। রাম বনে যাওয়ার জন্য রঙ্গশালা থেকে বল্কল চেয়ে নেন। কিন্তু প্রথমে সীতা এবং এরপর লক্ষ্মণও অন্তঃপুরে উপস্থিত হয়ে রামের সঙ্গে বনে যেতে চান। রামের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বনের উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেন। যাওয়ার পূর্বে অযোধ্যাবাসীদের সামনে রামের আদেশে সীতা অবগুণ্ঠন খুলে মুখদর্শন করান। এরপর তাঁরা তিনজন একত্রে যাত্রা শুরু করেন। দ্বিতীয় অঙ্কে রাম বনে যাওয়ায় অযোধ্যা যেন শূন্যতায় ভাসতে থাকে। মহারাজও শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। কাঞ্চুকীয় সমুদ্রগৃহে অসুস্থ দশরথকে যখন সুমন্ত্রের আশ্রম থেকে রাম-সীতা-লক্ষ্মণ ব্যতীত শূন্য রথ নিয়ে ফিরে আসার কথা জানান তখন রাজা তাঁদের স্পর্শ পাবার জন্য ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। এমতাবস্থায় তিনি তাঁর পিতৃপুরুষদের (রাজা দিলীপ, রঘু ও অজ) দেখতে পান। এর কিছুকাল পরেই তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং লোকান্তরিত হন। তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায় ভরত মাতুলগৃহ থেকে অযোধ্যায় ফেরার পথে বিশ্রামের উদ্দেশে এক মন্দির দেখে রথ থামান। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করে দেখেন, সেখানে শিল্পনৈপুণ্যে পূর্ণ কিছু মূর্তি। দেবতা ভেবে প্রণাম করতে যাবেন, এমন সময় দেবকুলিক উপস্থিত হন এবং প্রণাম করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। তিনি জানান মূর্তিগুলো ক্ষত্রিয়দের, দেবতাদের নয়; তাই কোনো ব্রাহ্মণ যেন ভুল করে দেবতা ভেবে প্রণাম না করেন, একারণে নিষেধ করেছেন। অবশেষে ভরত তাঁর কাছ থেকে আরো জানেন যে, মূর্তিগুলো ইক্ষ্বাকুবংশের– যাঁরা সকলেই অযোধ্যার রাজা ছিলেন। তিনি তখন শ্রদ্ধাভরে একে একে প্রণাম করলেন– রাজা দিলীপ, রঘু ও অজকে। কিন্তু এরপরই দেখলেন রাজা দশরথের মূর্তি। জীবিত জনের মূর্তি রাখা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে দেবকুলিক জানান তিনি দেহরক্ষা অর্থাৎ মারা গেছেন। ভরত আরো শুনলেন পত্নী (কৈকেয়ী)-র পণ রক্ষা করতে গিয়ে রামকে চৌদ্দো বছরের জন্য বনে পাঠিয়েছেন, সঙ্গে সীতা ও লক্ষ্মণও গেছেন। আর এ শোক সইতে না পেরে রাজা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এসব কথা জেনে ভরত রাজ্যে ফিরে মাতা কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করলেন এবং সুমন্ত্রকে নিয়ে তখনই রামের সন্ধানে যেতে চাইলেন। চতুর্থ অঙ্কে প্রবেশক অংশে বিজয়া এবং নন্দিনিকার আলাপে জানা যায়, মন্ত্রীরা ভরতের অভিষেকের সমগ্রী আনলেও ভরত সবকিছু উপেক্ষা করে রাম যে তপোবনে আছেন সেখানে চলে গেছেন। এরপর ভরত ও সুমন্ত্র রামের সঙ্গে দেখা করেন। ভরত রামকে অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিতে চাইলেও রাম পিত্রাদেশ পালনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়ায় বনেই থেকে যান। সীতা ও লক্ষ্মণও ভরতকে সমবেদনা জানিয়ে চলে যেতে বলেন। ভরত তখন রামের কাছে দুটি প্রার্থনা জানান, তা হলো: (১) চৌদ্দো বছর বনবাসের পর রাম রাজ্যভার গ্রহণ করবেন এবং (২) অভিষেক বারি ঢালতে রামের পাদুকা জোড়া দিতে। রাম রাজি হলে ভরত সানন্দে অযোধ্যার পুরবাসীদের সন্তুষ্ট করতে রামের পাদুকা নিয়ে আসেন। পঞ্চম অঙ্কে রাম-সীতা পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধের ক্রিয়ানুষ্ঠান কিভাবে করবেন আলাপ করছেন, এমন সময় রাবণ পরিব্রাজক বেশে উপস্থিত হন। রামের আতিথেয়তা গ্রহণ করেন। এরপর রামের সঙ্গে বিভিন্ন শাস্ত্র বিষয়ক আলাপ শুরু করেন। আলাপ চলাকালে রাম শ্রাদ্ধকর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলে রাবণ বলেন, স্বর্ণমৃগ দিয়ে তর্পণ করলে পিতৃপুরুষের আত্মা শান্তি লাভ করেন। হঠাৎ করে সেই আশ্রমেই স্বর্ণমৃগ দেখা গেলে রাম তখনই সে মৃগ আহরণে বের হন। আর শঠকারী রাবণ সুযোগ পেয়ে ছদ্মবেশ পরিহার করে সীতাকে নিয়ে শূন্যে পাড়ি দেন। জটায়ু বাধা দিতে গেলে রাবণের খড়্গ হাতে প্রতিহত করতে উদ্যত হলেন। ষষ্ঠ অঙ্কে বিষ্কম্ভক অংশ থেকে জানা যায় আকাশে জটায়ু ও রাবণের মধ্যে

যুদ্ধের সময় রাবণের তরবারির আঘাতে জটায়ুর ডান কাঁধে পড়লে তিনি ভূমিতে পতিত হন। এসব কথা রামকে জানাতে যাওয়ার মধ্য দিয়ে শেষ হয় এ অংশ। অন্যদিকে রামের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে রাজ্যে ফিরে সুমন্ত্র ভরতকে সীতা হরণের কথা জানালে ভরত আবেগে ভেঙ্গে পড়েন এবং অন্তঃপুরে গিয়ে মাতা কৈকেয়ীকে সব জানিয়ে পুনরায় ভর্ৎসনা করেন। রামের বনবাস, পিতার মৃত্যু এমনকি রাবণ কর্তৃক সীতাহরণের জন্য মাতাকেই দায়ী করেন ভরত। তখন কৈকেয়ী ভরতকে জানান মহারাজ অন্ধমুনির দ্বারা অভিশপ্ত ছিলেন বলেই এসব ঘটেছে। ভরতকে তখন সুমন্ত্রও এ অভিশাপের কথা জানান। "তেনোক্তং রুদিস্যান্তে মুনিনা সত্যভাষিণা! যথাহং ভোস্তমপ্যেবং পুত্রশোকাদ্ বিপৎস্যতে।।" (প্রসূন বসু ৩৬২: ৬/১৫)। সব শুনে ভরত অনুতপ্ত হন মাতার সঙ্গে এমন আচরণ করার জন্য। সপ্তম অঙ্কে মিশ্র বিষ্কম্ভকে একজন তাপস ও নন্দিলকের আলাপে জানা যায়, সীতার অপহরণকারী রাবণকে রাম পরাজিত করে বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অধিষ্ঠিত করেছেন, দেব ও দেবর্ষির সামনে সীতা নিষ্কলঙ্ক প্রতিপন্ন হওয়ায় রাম সীতাকে নিয়ে আকাশপথে বিমানে চড়ে ভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। এ অংশের পর দেখা যায়, রাম আশ্রমের পুরোনো স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। এমন সময় আশ্রমে ভরত মায়েদের নিয়ে উপস্থিত হলেন। সকলের অভিবাদন শেষে মাতা কৈকেয়ী রামকে অভিষেক গ্রহণ করতে বলেন। সব বিঘ্ন অবসান ঘটিয়ে রামের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এরপর ভরতবাক্যের মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি ঘটে।

চারুদত্ত নাট্যের বিষয়বস্তু:

চারুদত্ত নামক রূপকটি চার অঙ্কবিশিষ্ট। অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসারে এ রূপকে প্রকরণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ বিদ্যমান। তবে প্রকরণের ক্ষেত্রে দশ অঙ্ক বা তার অধিক থাকবে বলা হলেও এখানে চার অঙ্ক রয়েছে। এ নাটকের প্রথম অঙ্কে প্রস্তাবনা শেষে বিদূষক মৈত্রেয় ও নায়ক চারুদত্তের কথোপকথনে জানা যায় জাতিতে ব্রাহ্মণ আর পেশায় বণিক চারুদত্ত একদা সম্পদশালী থাকলেও ভাগ্যচক্রে তিনি আজ দরিদ্র হয়েছেন।

অন্যদিকে রাতে উজ্জয়িনী নগরের গণিকা বসন্তসেনাকে পথমধ্যে একলা পেয়ে তাড়া করে শকার ও তাঁর সহযোগী বিট। বসন্তসেনা তখন কোনো উপায় না পেয়ে চারুদত্তের বাড়িতে ঢুকে পড়েন। সেখানে চারুদত্তকে দেখে তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ আচরণে বসন্তসেনা অনুরক্ত হন। একইভাবে দরিদ্র চারুদত্তের মনে অনুরাগের সঞ্চার হয় গণিকা কন্যা নাট্যরঙ্গিণী বসন্তসেনার জন্য। বসন্তসেনা দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা পেতে তাঁর শরীরের সমস্ত গহনা চারুদত্তের হাতে গচ্ছিত রেখে চলে যান। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখা যায় চারুদত্তের প্রেমে কাতর উদাসীন বসন্তসেনাকে। চেটী মদনিকা বুঝতে পারেন তিনি কাউকে ভালোবেসেছেন। এরপর বসন্তসেনা মদনিকার কাছে চারুদত্ত সম্পর্কে যখন কথা বলছিলেন এমন সময় সংবাহক ভীষণ ভয়ার্ত হয়ে বসন্তসেনার কাছে আশ্রয় নেন। পূর্বে তিনি চারুদত্তের অঙ্গসংবাহনের কাজ করতেন। কিন্তু চারুদত্ত দু হাতে দান করতে করতে নিঃস্ব হওয়ায় সবাইকে পাওনা বুঝিয়ে বিদায় জানিয়েছেন। আর তাই দুর্ভাগ্যবশত আজ সংবাহক জুয়াড়ি এবং ঋণগ্রস্ত। সংবাহকের কাছে চারুদত্তের প্রশংসা শুনে বসন্তসেনা ঋণমুক্ত করে তাঁকে বিদায় জানান। তৃতীয় অঙ্কে চারুদত্তের দাস বর্ধমানবক অষ্টমী তিথিতে গচ্ছিত গহনার ভাণ্ড বিদূষকের হাতে হস্তান্তর করেন। এরপর সবাই ঘুমিয়ে পরলে ঐ রাতেই চারুদত্তের গৃহ থেকে সজ্জলক সিঁধ কেটে সুবর্ণভাণ্ড চুরি করে। কারণ তার প্রেমিকা মদনিকা (বসন্তসেনার দাসী)। আর মদনিকাকে পেতে হলে বসন্তসেনাকে মুক্তিপণ দিতে হবে। সকালে যখন চারুদত্ত জানলেন গহনাপাত্র চুরি হয়েছে তখন খুব অনুশোচনায় ভুগছিলেন কি জবাব দিবেন বসন্তসেনাকে? ঠিক এ সময় ব্রাহ্মণী (চারুদত্তের স্ত্রী) দাসী রদনিকার কাছ থেকে চুরির কথা জেনে তাঁর বাবার বাড়ি থেকে পাওয়া লক্ষ মুদ্রা দামের রত্নহার দান করেন বিদূষককে পূজার অজুহাতে। চতুর্থ অঙ্কে দেখা যায়, একদিন বসন্তসেনা চিত্রফলকে চারুদত্তের ছবি আঁকছেন। ঠিক এমন সময় চেটী

এসে জানায় রাজার শ্যালক সংস্থান পদ্মমুখী গাড়ি পাঠিয়েছেন। তাই মা আজ্ঞা করেছেন সজ্জিত হয়ে বসন্তসেনা যেন বের হয়। শুনে কিছুটা রেগে বসন্তসেনা বলেন চারুদত্তের সাথে অভিসারে যাওয়ার সময়ই সাজবেন তিনি। এমন সময় হঠাৎ সজ্জলকের কণ্ঠ শুনে চেটী সেখানে। সজ্জলক মদনিকাকে চুরি করা গহনা দেয় বসন্তসেনাকে দেয়ার জন্য। গহনা দেখেই মদনিকা বুঝে ফেলে এগুলো চারুদত্তের কাছে বসন্তসেনার গচ্ছিত গহনা। তখন মদনিকা গহনা চারুদত্তের কাছে ফিরিয়ে দিতে বলে; কিন্তু সজ্জলক রাজি না হওয়ায় বলে এগুলো বসন্তসেনাকে দিয়ে বলতে যে চারুদত্তই তার মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। আর তাদের এ পরিকল্পনার কথা আড়াল থেকে সবটাই শুনেন বসন্তসেনা। এরই মধ্যে বিদূষক সেখানে বসন্তসেনাকে মুক্তাহারটি দিয়ে বলেন চারুদত্ত এটি পাঠিয়েছেন। কেননা তাঁর দেওয়া সমস্ত গচ্ছিত গহনা জুয়াখেলায় খুইয়ে ফেলেছেন তিনি। বসন্তসেনা হারটি গ্রহণ করেন এবং চারুদত্তের ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন। বিদূষক চলে যাওয়ার পর সেখানে মদনিকা আর সজ্জলক এসে বসন্তসেনাকে বলে, চারুদত্ত তার মাধ্যমে গচ্ছিত গহনা ফিরিয়ে দিয়েছেন। বসন্তসেনা তাঁকে চারুদত্তের কাছে পুনরায় দিয়ে আসতে বলেন; কিন্তু সজ্জলক অপারগতা প্রকাশ করলে বসন্তসেনা তাঁকে বলেন, চারুদত্তের ঘরে তিনি যে সিঁধ কেটেছিলেন তা তিনি জানেন। সজ্জলককে অবাক করে দিয়ে মদনিকাকে নিজের গহনা দিয়ে সাজিয়ে সজ্জলকের হাতে তুলে দেন। এভাবেই নাটকের সমাপ্তি হওয়ায় মনে করা হয় রচনাটি অসম্পূর্ণ।

উল্লিখিত ভাসকৃত নাট্যত্রয়ীতে বিধৃত সমাজব্যবস্থা:

ভাসের রচনায় রামায়ণ, মহাভারতের বিষয়াবলিসহ লোকমুখের প্রচলিত কাহিনি স্থান পেয়েছে। তবে তা লেখকের নিজস্বতার ভিন্ন আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে। ভাসকৃত এ তিনটি রূপক খুব জীবনঘনিষ্ঠ। অলৌকিকত্বের আশ্রয় না নিয়ে মানবজীবনের বিভিন্ন বিষয় পরিস্ফুট হয়েছে তাঁর নাটকগুলোতে। একারণে ভাসের রচনায় তৎকালীন সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া সম্ভব হয়। মূলত কোনো সমাজের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম, পেশা, বিবাহপ্রথা, জাতি, বর্ণ প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিকভাবে পর্যালোচনা করতে হলে সাহিত্য খুব গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। ভাসের নাটক বাস্তবধর্মী হওয়ায় সেসময়ের রাজা ও রাজ্যপরিচালনার ব্যবস্থাপনা, নারীদের অবস্থান, সামাজিক মূল্যবোধ, সংস্কৃতি, বিবাহ, পেশা প্রভৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

স্বপ্নবাসবদত্ত নাটকে ভাস তৎকালীন রাজতন্ত্র তথা রাজ পরিবারের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে বৎসরাজ উদয়ন প্রজাহিতৈষী রাজা। তিনি সর্বদা প্রজাদের জন্য হিতকর ছিলেন। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সার্বক্ষণিক রাজাকে বিপদমুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন এবং রাজা ও রাজ্যের মঙ্গলার্থে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেও দ্বিধা করেননি। সেসময় যে রাজ্যকে সুরক্ষার জন্য পার্শ্ববর্তী শক্তিশালী রাজাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিবাহ একটা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল তা এই নাটকে নাট্যকার তুলে ধরেছেন। বৎসরাজ উদয়নের ও মগধরাজ দর্শকের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করার লক্ষ্যে রাজকন্যা পদ্মাবতীর সাথে উদয়নের বিবাহের তিনি পরিকল্পনা করেন। এভাবে বিবাহকার্য সম্পন্ন হয় এবং বিবাহোত্তর উদয়ন রাজা দর্শকের সহযোগিতায় আরুণির কাজ থেকে হৃতরাজ্য উদ্ধার করেন। এছাড়াও মন্ত্রী বাসবদত্তাকে পদ্মাবতীর কাছে গচ্ছিত রাখেন। কারণ ভবিষ্যতে বাসবদত্তার চরিত্র নিয়ে রাজার মনে কোনো আশঙ্কা সৃষ্টি হলে পদ্মাবতীই যেন সেই সংশয় দূর করতে পারেন। রাজা এবং রাজ্যের মঙ্গল কামনায় মন্ত্রী অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে নিজেকে আত্মনিয়োগ করেন। এ নাটকেও এ বিষয়টি বারংবার উঠে এসেছে। রাজা উদয়নের ব্যক্তিগত বিষয়ে মন্ত্রী একাধিক হস্তক্ষেপ করেছেন। রাজ্য সুরক্ষার ক্ষেত্রে একজন মন্ত্রীর বিচক্ষণতা যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা অত্যন্ত সুচারুভাবে তুলে ধরেছেন ভাস।

ভাস তাঁর এই নাটকে রাজমহিষী বাসবদত্তাকে একজন পতিব্রতা নারী রূপে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর প্রাণপ্রিয় স্বামী উদয়ন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন বৎসরাজ্য আরুণি কর্তৃক হৃত হয়েছে, মগধরাজ দর্শকের সাহায্য ছাড়া হৃতরাজ্য ফিরে পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তখন তিনি নিজের প্রাণপ্রিয় স্বামীকে অন্যের হাতে সমর্পণ করতেও দ্বিধা করেন নি। অর্থাৎ পদ্মাবতীর সাথে উদয়নের বিবাহকার্য সম্পন্ন করতে সাহায্য করেন। লক্ষ্য তখন একটাই, তা হলো হৃত রাজ্য স্বামীকে ফিরিয়ে দিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া। একজন নারীর জন্য এ এক আত্মত্যাগই বটে। রাজা যে বাসবদত্তার জীবিত অবস্থায় বিয়ে করতে রাজি হবেন না– তিনি তা জানতেন। আর তাই নিজের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটিয়েছেন এবং রাজ্য উদ্ধারে মন্ত্রীর পরিকল্পিত প্রতিটি কাজে সহযোগিতা করেছেন। এসব কাজে তিনি বারংবার মানসিক আঘাত সহ্য করেছেন। তথাপি তিনি রাজ্য উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত একজন সাধারণ আবন্তিকার বেশ ধারণ করেছেন। এমনকী পদ্মাবতী আর উদয়নের বিয়ের মালাও গেঁথে দিয়েছেন। স্বামীর মঙ্গলের জন্য এমন দুঃসাধ্য কাজ করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। পতিব্রতা এ নারীর পাশাপাশি অত্যন্ত ধীরস্বভাবসম্পন্ন বুদ্ধিদীপ্ত পদ্মাবতী নামক নারী চরিত্রের উপস্থিতি রয়েছে এ নাটকে। পদ্মাবতীর আচরণের মধ্যে রাজপরিবারের পরম্পরা এবং আভিজাত্য দৃশ্যমান। রাজপরিবারের আভিজাত্যের পরিচয় দিয়েছেন পদ্মাবতী। অভিজ্ঞ কঞ্চুকীর নিষেধ সত্ত্বেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ পদ্মাবতী আবন্তিকা (বাসবদত্তা)-কে ন্যাস রাখতে দ্বিধা করেননি। ভাসের এ নাটকে বাসবদত্তা এবং পদ্মাবতী দুটি নারী চরিত্র দেখলে সহজেই অনুমান করা যায় সেসময়ের নারীদের অবস্থান সম্পর্কে। কেবল তাই নয়; এই দুই চরিত্রের বিভিন্ন আচরণে তৎকালীন পারিবারিক মূল্যবোধ প্রস্ফুটিত হয়েছে। রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করলেই যে কেবল নিজের সুখের বিষয় বিবেচনা করার সুযোগ নেই তা আমরা যেমন রামায়ণ, মহাভারত সহ প্রভৃতি রচনায় বহুবার দেখতে পাই; ঠিক তেমনি এক্ষেত্রেও বাসবদত্তার আত্মত্যাগ বা পদ্মাবতীর সত্য রক্ষা বা তাঁকে রাজা উদয়নের জন্য সহানুভূতিশীল হয়ে বিয়ে করার মতো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দেখতে পাই। বৃহৎ স্বার্থে তাঁরা দুজনেই নিজের সুখ বিসর্জন দিতে কখনো কুণ্ঠিত হননি।

উল্লিখিত তিনটি নাটকের ক্ষেত্রেই বিবিধ কারণে একাধিক প্রণয় বা বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। *প্রতিমা* নাটকে অযোধ্যার রাজা দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা নামে তিনজন স্ত্রী রয়েছে। *চারুদত্ত* নাটকে চারুদত্তের একজন স্ত্রী ছিল তথাপি গণিকা বসন্তসেনার প্রতি অনুরাগ জন্মেছিল। যদিও প্রকরণ শ্রেণির এ রূপকটি অসম্পূর্ণ বলে হয়তো তাঁদের এ অনুরাগ নাটকে সফল পরিণয় পায়নি। *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকেও রাজা উদয়নকে প্রানপ্রিয় স্ত্রী বাসবদত্তার বিয়োগে এক বুক ভালোবাসা নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করতে দেখা গিয়েছে। এছাড়া এ নাটকে মহাসেনের ষোড়শ পত্নীর উল্লেখ রয়েছে।[২] সুতরাং সেসময়ের সমাজব্যবস্থায় বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল বলা যায়। তিনটি নাটকেই নারীদের অবস্থান অন্তঃপুরে দেখা যায়। রাজকন্যা বা রাজবধূদের রাজকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনোরূপ অংশগ্রহণ নেই। তবে রাজা বা রাজ্যের হিতসাধনে পরোক্ষভাবে বাসবদত্তা, পদ্মাবতী, সীতার অংশগ্রহণ দৃষ্টিগোচর হয়।

আলোচ্য নাট্যসমূহে বিভিন্ন ধরনের বিবাহের বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন: *স্বপ্নবাসবদত্ত*-এ পদ্মাবতী ও রাজা উদয়নের ব্রাহ্ম বিবাহ (অর্থাৎ সদ্‌বংশজাত পাত্র-পাত্রীর পারিবারিকভাবে কন্যা সম্প্রদানের মধ্য দিয়ে) হয়। এ নাটকের তৃতীয় অঙ্কে দেখা যায়, এ ধরনের বিবাহ রীতিতে 'অবিধবাকরণ' ও 'সপত্নীমর্দন' নামক দুটি মালা গাঁথার রেওয়াজ ছিল। *প্রতিমা*-নাটকের তৃতীয় অঙ্কে শুল্ক দানের মধ্য দিয়ে কৈকেয়ী-রাজা দশরথের আসুর বিবাহ, *চারুদত্ত*-এ চতুর্থ অঙ্কে সজ্জলক ও মদনিকার অনুলোম শ্রেণির বিবাহের বর্ণনা রয়েছে। এসব বর্ণনায় বোঝা যায়, সেসময়ের সমাজে এধরনের বিবাহ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

ভাস্কর্য তথা মৃত রাজাদের মূর্তি সংরক্ষণের বর্ণনা পাওয়া যায় *প্রতিমা* নাটকে। ভরত মাতুলগৃহ থেকে অযোধ্যায় ফেরার পথে ইক্ষ্বাকু বংশের রাজাদের মূর্তি দর্শন করেছিলেন। এ নাটকে সত্য রক্ষার্থে মহারাজ দশরথ ইচ্ছার বিরুদ্ধে রামকে চৌদ্দো বছরের জন্য বনে পাঠানো, অন্যদিকে রামের পরিবর্তে ভরতকে রাজার আসন গ্রহণের প্রস্তাব দিলে ভরতের সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা, রামকে ফিরিয়ে আনতে বনে যাওয়া, পিত্রাদেশ পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রামের অযোধ্যায় না ফেরা, ভরত ফিরে আসার সময় রামের পাদুকা নিয়ে আসা, পাদুকা সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করা, ভরতের মাতা কৈকেয়ীকে ভর্ৎসনা করা – এসব ঘটনায় সেসময়ের রাজপরিবারের চিত্র তুলে ধরেছেন ভাস। এখানে ভরতের ভ্রাতৃত্ববোধ, রামের পিতার আদেশ পালনে নিদারুণ কষ্টকে মেনে নেওয়া, মাতা কৈকেয়ীর বর চাওয়া এবং দশরথের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে বর প্রদান সত্য পালনের জন্য, ভরতকে কৈকেয়ীর পরবর্তীতে অন্ধমুনির অভিশাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া, ভরতের অনুশোচনা এবং মাতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা – এসবই যেন ঐ সময়ের পরিবার তথা সমাজের চিত্র। এ নাটকে স্পষ্টভাবে বর্ণভেদ প্রথা দৃশ্যমান। ব্রাহ্মণ উচ্চবর্ণ বিধায় তাঁরা ক্ষত্রিয়দের প্রণাম করতেন না। আর তাই দেবকুলিক ভরতকে ক্ষত্রিয় মূর্তিতে প্রণাম না করতে নিষেধ করেছিলেন। "ন খল্বৈতেঃ কারণৈঃ প্রতিষেধয়ামি ভবন্তম্। কিন্তু দৈবতশঙ্কয়া ব্রাহ্মণজনস্য প্রণামং পরিহরামি।" (প্রসূন বসু ৩৪২)।

রাজপরিবারের নারীদের মুখদর্শন করা সাধারণ লোকের জন্য দুঃসাধ্য ছিল। অযোধ্যা থেকে সীতাকে নিয়ে রাম বনবাসী হয়ে বনবাসের উদ্দেশ্যে যাবার সময় প্রথমবারের মতো সীতাকে অবগুণ্ঠন খুলে প্রজাদের মুখদর্শন করিয়ে তিনি বলেন–

স্বৈরং হি পশ্যন্তু কলত্রমেতদ্ বাষ্পাকুলাক্ষৈর্বদনৈর্ভবন্তঃ।
নির্দোষদৃশ্যা হি ভবন্তি নার্যো যজ্ঞে বিবাহে ব্যসনে বনে চ।।
(প্রসূন বসু ৩৪২: ১/২৭)।

অর্থাৎ হে পুরবাসীজন! শুনুন শুনুন, আপনারা সাশ্রুনেত্রে অবাধে আজ আমার পত্নীকে দর্শন করুন। যজ্ঞানুষ্ঠানে, বিবাহে, বিপদে এবং বনগমনে নারী দর্শনে দোষ নেই।

কবি-কল্পনায় তখনকার সময়ে যানবাহন হিসেবে আকাশপথে বিমানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম অঙ্কে লঙ্কার যুদ্ধ শেষে সীতাকে নিয়ে রাবণের বিমানে করে আশ্রমে ফিরেছিলেন এবং বিমানে বসে নিচের দৃশ্যের অপূর্ব বর্ণনা করেছেন।

চারুদত্ত নামক রূপকটি যেন লোকায়ত জীবনের প্রতিচ্ছবি। নিদারুণ দারিদ্র্যের বর্ণনা রয়েছে এখানে। বণিক চারুদত্ত দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণে নগরের সকলেই চরিত্রটির গুণের অনুরক্ত ছিলেন। শত দারিদ্র্যের মাঝেও চারুদত্ত তাঁর আত্মসম্মান হারাতে রাজি নন। যার ফলে প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর কাছ থেকে রত্নহারটি পাওয়া বলে খুব তিনি খুব অনুতপ্ত হন। এখানে স্ত্রীর দান যেন তাঁর ব্যক্তিত্বকে আঘাত হানে। তিনি বলে উঠেন–

"ময়ি দ্রব্যক্ষয়ক্ষীণে স্ত্রীদ্রব্যেণানুকম্পিতঃ।
অর্থতঃ পুরুষো নারী, যা নারী সার্থতঃ পুমান্।।"
(প্রসূন বসু ১১৫: ৩/১৭)।

অর্থাৎ বিভবনাশের দরুন আমার এমনি শোচনীয় দশা যে, স্ত্রী তাঁর দ্রব্য দিয়ে আমায় অনুকম্পা করছেন। বস্তুতঃ, পুরুষ হয়েছে নারী, আর যিনি নারী তিনিই কার্যক্ষেত্রে হলেন পুরুষ।

এখানে এই বর্ণনায় যেন পুরুষ প্রধান পরিবারের চিত্র পাওয়া যায়। একটা পরিবারের সমস্ত দায় যেন কেবল পুরুষের। সেখানে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে স্ত্রীলোক সহযোগিতার হাত বাড়ালে যেন পুরুষের পরাজয়। একারণেই হয়তো চারুদত্ত তাঁর স্ত্রীর সহযোগিতাকে অনুকম্পা মনে করছেন।

প্রকৃতপক্ষে ভাস তাঁর রচনায় রাজপরিবার থেকে চারুদত্তের মতো সাধারণ মানুষের পরিবারে দেখিয়েছেন পরিবারের মূল একজন রাজা বা পুরুষ। কেবল তাই নয়; সকলেই পরিবার-প্রধানকে খুব সম্মান বা শ্রদ্ধা করতেন। *প্রতিমা* নাটকে পিতা দশরথের সত্য পালনে রাম বল্কল ধারণ বিনা বাক্যে বনবাসে যান। *স্বপ্নবাসবদত্ত*-এ বাসবদত্তা রাজা উদয়নের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে পদ্মাবতীর আশ্রয়ে থাকেন। *চারুদত্ত*-এ ব্রাহ্মণীর চরম দারিদ্র্যের মাঝে বেঁচে যাওয়া একমাত্র রত্নহার দিতেও দ্বিধা করেন নি।

ভাসের *চারুদত্ত*-এর নায়িকা একজন গণিকাকন্যা। অর্থাৎ সেসময়ের সমাজে গণিকা বৃত্তি ছিল এবং লোকসমাজ তাদের ঘৃণার চোখেই দেখতো। বসন্তসেনা ও চারুদত্ত পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হলেও গণিকার রাখা গচ্ছিত গহনা বলে চারুদত্ত নিজের ঘরের অন্তঃপুরে তা রাখেন নি। "...বাহ্যজনধারিতমলঙ্কারং গৃহজনো ন দ্রক্ষ্যতি।" (প্রসূন বসু ১১০)। আবার জীবনের প্রয়োজনে গণিকা বৃত্তি করলেও চারিত্রিক গুণাবলির দিক থেকে বসন্তসেনা একজন আত্মমর্যদাবোধসম্পন্ন নারী। অর্থের লোভ তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি বলেই তিনি চারুদত্তের মতো একজন হতদরিদ্র লোকের প্রেমে পড়েন। এভাবে এ রূপকে বারংবার প্রকাশ পেয়েছে সেসময় অর্থের চেয়ে গুণের কদর বেশি ছিল। তবে সমাজে গণিকাদের বৃত্তিটি নিন্দনীয় থাকায় হয়তো শেষঅবধি সফল পরিণয় দেখানো হয়নি। এর পাশাপাশি সজ্জলক ও মদনিকার প্রণয় সফল দেখানো হয়েছে। তবে মদনিকা আর সজ্জলককে গণিকালয় থেকে চির মুক্তি দিয়ে পাঠিয়ে দেন বসন্তসেনা। কারণ গণিকালয়ে থাকলে তাদের প্রণয় বা স্বাভবিক জীবনযাপন হয়তো সমাজ গ্রহণ করত না।

ভাসকৃত আলোচ্য এয়ীনাট্যের আলোকে বলা যায়, তৎকালীন সমাজে বিভিন্ন রকমের পেশা ছিল। যেমন– বাণিজ্য, দাসত্ব, জুয়াখেলা, চুরি, গণিকা বৃত্তি প্রভৃতি। *চারুদত্ত* নামক নাট্যে চারুদত্ত পেশায় বণিক, বিট শকারের দাস ছিলেন। সংবাহক জুয়া খেলতে খেলতে নিঃস্ব হলে জুয়াড়ি মহাজনের ভয়ে পালাতে পর্যন্ত দেখা যায়। সমাজে সাধারণদের ভালো কাজ করতে দেখা গেলেও রাজপথেই জুয়ার আসর দেখা যায়। তৃতীয় অঙ্কে চারুদত্তের গৃহে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সিঁধ কেটে সজ্জলকের চুরির বর্ণনা রয়েছে।

তখনকার সমাজ-ব্যবস্থায় তিন ধরনের নারী দেখা যায়– (১) কুলবধূ (২) গণিকা এবং (৩) দাসী। *চারুদত্ত* নাটকে কুলবধূ চারুদত্তের স্ত্রী ব্রাহ্মণীকে অন্তঃপুরে আর বারাঙ্গনায় বসন্তসেনাকে দেখা যায়। কুলবধূর সম্মান ছিল সর্বোচ্চ। ভাস তিনটি রচনার কুলবধূকেই দেখা যায় পতিব্রতা নারী অর্থাৎ স্বামীর মঙ্গলের জন্য নিজের সর্বোচ্চ সুখও বিজর্সন করেছেন। স্বামীর সুখ-দুঃখের সাথী কুলবধূ/স্ত্রী। বাসবদত্তা রাজমহিষী, রাজকন্যা হয়েও স্বামীকে ব্রাহ্মণী স্বামীর সম্মান রাখতে নিজের মূল্যবান হারখানি দিতে একটুও দ্বিধা করেননি। *স্বপ্নবাসবদত্ত* নাটকে বাসবদত্তা, পদ্মাবতী এমনকী *প্রতিমা* নাটকে স্বামীর সম্মান বৃদ্ধিতে সীতার চরিত্রে এমন বিষয়গুলো রয়েছে। সীতা বিনা অপরাধে কেবল স্বামীর পাশে থাকার জন্য কুলবধূ হওয়া সত্ত্বেও বনে গমন করেছিলেন। নিজের সুখের কথা ভাবেন নি সীতা। স্বামীর সঙ্কটকালে সহচরী হয়ে কুলবধূর দায়িত্ব পালন করেছেন।

গণিকা শ্রেণির নারীদের সমাজে সম্মান না থাকলেও সমাজের বিত্তবানদের কাছে চাহিদা ছিল। রাজার শ্যালক গাড়ি পাঠিয়েছিলেন বসন্তসেনাকে নিতে। তখনকার সময়ে দাসীরা নিষ্ঠার সাথে প্রভুর সেবা করতেন এবং সর্বদা তাঁদের হিতার্থে কাজ করতেন। মদনিকা ঠিক এমন শ্রেণিরই উদাহরণ। সর্বদা বসন্তসেনার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। গণিকা বৃত্তিতে বসন্তসেনা তাঁর জীবননির্বাহ করছেন। তবে এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, মদনিকা-সজ্জলকের প্রেমের বিষয়ে বুঝতে পেরে বাসবদত্তা নিজের গহনা দিয়ে মদনিকাকে সাজিয়ে দেন এবং সজ্জলকের হাতে নিজে তাকে অর্পণ করেন। মোট কথা মদনিকাকে মুক্তি দেন গণিকালয় থেকে। এ থেকে ধারণা করা যায়, কেউ যদি গণিকা বৃত্তি ছেড়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে চায় সেসময়ের সমাজে সেই সুযোগ বা ব্যবস্থা ছিল।

বসন্তসেনার চতুরিকা ও বিচ্ছিত্তিকা নামেও আরো দুজন দাসী ছিল। *চারুদত্ত*-এ ব্রাহ্মণীর দাসী রদনিকা, *স্বপ্নবাসবদত্ত*-এ রাজকন্যা পদ্মাবতীর মধুকরিকা ও পদ্মিনিকা নামে চেটী অর্থাৎ দাসীএবং *প্রতিমা* নাটকে মন্থরা ছাড়াও বিজয়া ও নন্দিলীকা নামে দুজন দাসী ছিল রানি কৈকেয়ীর।

প্রাচীন সাহিত্য বা ধর্মশাস্ত্রে চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) এবং চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বৈদিক যুগের কর্মের ভিত্তিতে সমাজে চতুর্বর্ণ প্রচলিত থাকলেও ধীরে ধীরে তা জন্মের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতে থাকে। ভাসের রচনায় মধ্যে চতুর্বর্ণ এবং চতুরাশ্রমের উল্লেখ রয়েছে। *স্বপ্নবাসবদত্ত*-এর প্রথম অঙ্কে বেদাধ্যয়নের জন্য ব্রহ্মচারী লাবাণক গ্রামে বসবাস করতেন এমনটাই জানান। অর্থাৎ এখানে ব্রহ্মচর্য আশ্রমের কথা বলা হয়েছে। এছাড়াও যৌগন্ধরায়ণের মুখে প্রথম অঙ্কের নবম শ্লোকে শোনা যায় তিনি জীবিকার জন্য কাষায় বস্ত্র (অর্থাৎ গেরুয়া) ধারণ করেন নাই। তিনিও সন্ন্যাস বৃত্তির উদ্দেশ্যে পরিব্রাজক বেশ ধারণ করেছেন। প্রথম অঙ্কে পদ্মাবতী তপোবনে এসেছিলেন তাঁর সন্ন্যাসিনী মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে। *চারুদত্ত*–এর দ্বিতীয় অঙ্কে সংবাহক সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণা হওয়ায় প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। *প্রতিমা* নাটকের পঞ্চম অঙ্কে পরিব্রাজক বেশে রাবণ রামের দ্বারে উপস্থিত হলে রাম তাঁকে ভগবান্ সম্বোধন করে গভীর শ্রদ্ধা ভরে সেবা করেন। এ থেকে বোঝা যায়, সে যুগে যাঁরা সন্ন্যাস আশ্রম পালন করতেন তাঁদের সকলে ভক্তি সহকারে সেবা করতেন। *প্রতিমা* নাটকে প্রথম অঙ্কে ভট্টিনী সীতাকে জানান, “ময়া শ্রুতং– ভর্তৃদারকম-ভষিচ্য মহারাজো বনং গমিষ্যতীতি” (প্রসূন বসু ৩২৯) অর্থাৎ আমি শুনলাম কুমারের অভিষেকের পর মহারাজ বনে যাবেন। রাজা দশরথের এমন ইচ্ছা থেকে বোঝা যায়, গার্হস্থ্য জীবনের দায়িত্ব পালন শেষে বাণপ্রস্থে যাওয়ার রীতি সেযুগে ছিল। এভাবে চতুরাশ্রমের পাশাপাশি চতুর্বর্ণও গুরুত্বের সাথে রচনাসমূহে স্থান পেয়েছে। *প্রতিমা* নাটকের পঞ্চম অঙ্কে পরিব্রাজক বেশে রাবণ এসে প্রথমেই ব্রাহ্মণের পালনীয় আচারসমূহ সম্পন্ন করেন। তিনি জানান অঙ্গ ও উপাঙ্গ সহ বেদ, মনু প্রণীত ধর্মশাস্ত্র, মহেশ্বর-ভাষিত যোগশাস্ত্র, বৃহস্পতি প্রণীত অর্থশাস্ত্র মেধাতিথির ন্যায় শাস্ত্র এবং বরুণ রচিত শ্রাদ্ধবিধি অধ্যয়ন করেছেন।[৩] সমাজে ব্রাহ্মণেরই অবস্থান উঁচুতে ছিল বলে তাঁরা সকলের দ্বারা সম্মানিত হতেন। এরপরই ছিল ক্ষত্রিয়ের অবস্থান। *প্রতিমা* নাটকে তৃতীয় অঙ্কে ভরত প্রতিমাগৃহে দেবতাদের প্রতিমা মনে করে প্রণাম করতে গেলে দেবকূলিক তাঁকে নিষেধ করেন। কারণ বলতে গিয়ে জানান প্রতিমাগুলো ক্ষত্রিয়দের বলে কোনো ব্রাহ্মণ যেন প্রণাম না করেন। অর্থাৎ সেসময়ে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের প্রণাম করতেন না। ক্ষত্রিয়দের প্রধান কর্তব্য ছিল, যুদ্ধ করা। ক্ষাত্রধর্মের পরাক্রম সম্বন্ধে রাবণ সীতাকে হরণ করার সময় নাটকের পঞ্চম অঙ্কে বলেন, রাম যদি ক্ষাত্রধর্ম পালন করে থাকে তবে অবশ্যই সীতাকে রক্ষা করতে আসবে–

> মণ্ডূজাকৃষ্টনিস্ত্রিংশ কৃত্তপক্ষক্ষতচ্যুতৈঃ।
> রুধিরৈরার্দ্রগাত্রং ত্বাং নয়ামি যমসাদনম্।।
>
> (প্রসূন বসু ৩৫৮: ৫/২২)।

চারুদত্ত–এ বৈশ্যদের সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অঙ্কে সংবাহক এবং চতুর্থ অঙ্কে সজ্জলকের বর্ণনায় জানা যায়, বণিকদের পেশা ছিল ব্যবসা। তারা খুব অতিথি সেবা করতে ভালোবাসেন। এমনকী বণিকদের বসবাসের জন্য পৃথক পাড়াও ছিল। চারুদত্ত পেশায় বণিক হলেও জাতিতে ব্রাহ্মণ। এজন্যই তাঁর স্ত্রীকে ব্রাহ্মণী বলা হয়েছে। তিনি নিজেও আত্মীয়স্বজনকে নিয়ে থাকতে ভালোবাসতেন। বণিকদের পাড়ায় থাকতেন। এ রচনা থেকে জানা যায় সেসসময় জাতিতে বণিক হলেও অন্য পেশা গ্রহণের সুযোগ ছিল বলেই সংবাহক বণিক হওয়া সত্ত্বেও অঙ্গমর্দনের কাজ করতেন। এছাড়া *প্রতিমা* নাটকে শূদ্র সম্পর্কে তৃতীয় অঙ্কে জানা যায় তারা মন্ত্রহীণ প্রণাম করতে পারতেন।[৪]

পরিশেষে বলা যায়, ভাস তাঁর আলোচ্য নাট্যসমূহে কাহিনি বর্ণনার মধ্য দিয়ে সেসময়ের সমাজচিত্র চিত্রণ করেছেন। যেখানে পরিবার তথা পারিবারিক মূল্যবোধ, বিবাহ, রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি, জাতি প্রথা, চতুরাশ্রম সহ যাবতীয় তথ্যাদি উঠে এসেছে। বৈদিক যুগ পরবর্তী সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল তা-ই যেন স্পষ্ট হয়েছে আলোচ্য ত্রয়ীনাট্যে।

টীকা:

১. "… in 1909, Ganapati Sastri discovered palm-leaf manuscripts of ten plays in an old manor house near Padmanabha Puram, some twenty miles from Further investigation brought to light three more plays. All the thirteen plays were published by him as the works of Bhasa."- (Krishna Chaitanya ed. 1977, 289-290).

২. "ঘোড়শান্তঃপুরজ্যেষ্ঠা পুণ্যা নগরদেবতা।
মমপ্রবাসদুঃখার্তা মাতা কুশলিনী ননু? ৬/৯" (রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর সম্পা। ২০০৬, ২১৩)।

৩. "রাবণঃ– (আত্মগতম্) যাবদ হমপি ব্রাহ্মণসমুদাচারমনুষ্ঠামি। (প্রকাশং) ভোঃ! কাশ্যপগোত্রেন হস্মি। সঙ্গেড়পাঙ্গাং বেদমধীয়ে, মানবীয়ং ধর্মশাস্ত্রং, মহেশ্বরং যোগশাস্ত্রং, বার্হস্পত্যমর্থশাস্ত্রং, মেধাতিথের্ন্যায়শাস্ত্রং, প্রাচেতসং শ্রাদ্ধকল্পং চ" (প্রসূন বসু সম্পা। ২০১১, ৩৫৫)।

৪. "কামং দৈবতমিত্যেব যুক্তং নময়িতুং শিরঃ।
বার্ষলন্তু প্রণামঃ স্যাদমন্ত্রার্চিতদৈবতঃ।। ১/৫" (প্রসূন বসু সম্পা। ২০১১, ৩৪২)।

তথ্যসূত্র

প্রসূন বসু (সম্পাদিত)। সংস্কৃত *সাহিত্যসম্ভার* ১১তম খণ্ড। নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮১।

শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদনা ও অনুবাদ। –*স্বপ্নবাসবদত্তম্*, বিধান সরণী।

প্রসূন বসু (সম্পাদিত)। সংস্কৃত *সাহিত্যসম্ভার* ১ম খণ্ড। নবপত্র প্রকাশন, ২০১১।

প্রসূন বসু (সম্পাদিত)। সংস্কৃত *সাহিত্যসম্ভার* ১১তম খণ্ড। নবপত্র প্রকাশন, ২০১১।

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ঠাকুর সম্পাদিত। স্বপ্ন*বাসবদত্তম্*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬।

C R Devadhar. Cārudattam. Oriental Book Agency: 1943.

Krishna Chaitanya ed. *A New History of Sanskrit Literature*, 2nd edition, 1977.